পরোটা, সাধের পরোটা

দেশে থাকতে মায়ের হাতের পরোটার চেয়ে সুস্বাদু খাবার আর বোধহয় কিছু ছিলো না। অন্যদের কথা বলতে পারবো না কিন্তু যেদিন সকালে উঠে দেখতাম মায়ের মন ভালো এবং তিনি বেলন-পিঁড়ি নিয়ে যত্ন সহকারে পরোটা বেলছেন সেদিন আমার সমস্ড় দিনটাই যেন গুনগুনিয়ে গান গেয়ে উঠতো। পরোটা এবং কুচি কুচি করে ভাজা আলু। 'তেল চুপচুপে' আলু ভাজি। সেই স্বাদ যেন আজও জিহ্বার সর্বাগ্রে লেগে আছে।

বিদেশ বিভুঁইয়ে পাড়ি দেবার পর বেশ কয়েকটি বছর উচ্চ শিক্ষার পাটাতনে বলি হতে হতে পরোটা তো দূরে থাক দুই পয়সার পাউর"টি জোগাড় করতেও মাঝে মাঝে হিমসিম খেতে হয়েছে। কিন্তু সেই কঠিন বছরগুলোর মধ্যেই আলোর প্রদীপ হয়ে এলেন এক বর্ষীয়ান ভারতীয়। আমাদের দুই বেডর"মের এপার্টমেন্টের তৃতীয় র"মমেট নিরামিষাশী এই ছোটখাটো ভারতীয় ভদ্রলোকটির নাম ছিলো তিলাকপ ভি. মুর্তি, সংক্ষেপে মুর্তি। আমরা ডাকতাম মুর্তি দা। অচিরেই জানতে পারলাম তিনি যে শুধু গণিতেই মহাপ"িত তাই নয়, পরোটা প্রস্তুত এবং আলু ভাজায় তার ব্যুৎপত্তি কোন মায়ের চেয়েই কোন অংশে কম নয়। আহা, সে একদিন গেছে! পৃথিবীর অন্য মাথায় বসে আবার সুস্বাদু হাতে বেলা পরোটা এবং তেল চুপচুপে ভয়াবহরকম অস্বাস্থ্যকর আলু ভাজি - জিভে এখনই লোল পড়তে শুর" করেছে। যাইহোক, সেই প্রেম কাহিনী বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। মাস দুয়েক বাদেই যখন জামা-কাপড় সব টাইট হতে শুর" করলো এবং শরীরে বিশেষ রকম চেকনাই দেখা দিলো তখনই সবার টনক নড়লো। আমাদের ক্ষীণ বপু ওজন মাপার যন্ত্রটার উপর দাঁড়িয়ে তড়াক করে

লাফিয়ে নেমে তওবা কেটে পরোটায় ইস্ড়ফা দিয়েছিলাম। দুই শ হতে আঙ্গুল বাকি ছিলো। শ্রীকান্ড়ের শুকনো কাঠে ফুল ধরে যাবার দশা।

সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন গত হয়েছে বহু বছর। ঘরনী হয়েছে, পুত্র কন্যা হয়েছে, নানান ঘাটের পানি খেয়ে, স্কারবোরোর সুউচ্চ এপার্টমেন্ট কমপেক্সের পিছুটান ফেলে নিকটবর্তী এজাক্সে এসে উঠে কিঞ্চিত সুস্থির হয়ে বসেছি। এই দেশে যারা থাকেন শুধু তারাই নন, বাংলাদেশের মানুষেরাও ভালোমতই অবগত যে এখানে গৃহকর্মে সাহায্য করবার মতো মানুষ পাওয়া প্রায় অসম্ভবই। ফলে অধিকাংশ মহিলাদেরকেই ঘর ঝাড়ু দেয়া থেকে শুর“ করে রান্না করা, কাপড় ধোয়া, বাথর“ম পরিষ্কার করা সহ ঘরের তাবৎ কাজই করতে হয়। কিছু গৃহকর্তারা শুনেছি কর্ত্রীদের ফাই ফরমায়েশ খেটে থাকেন। আমার শরীরে আলসেমি ব্যতিরেকে অন্য কোন অস্থি না থাকায় আমাকে দিয়ে এক গাস পানি আনাতেও দশবার বলতে হয় বিধায় গৃহকর্মের তুচ্ছ ব্যাপারে অর্ধাঙ্গিনী আমাকে বহু আগেই বিরক্ত করা বন্ধ করে দিয়েছেন। মন্দ কথা উঠতে বসতে শুনতে হয় কিন্তু কথায় কি আসে যায়। দু'দিন গায়ে ফোটে, তৃতীয় দিনে সয়ে যায়, চতুর্থ দিনে মধু মনে হয়।

সমস্যা একটিই। হাতে বেলা পরোটা খাবার আগ্রহ ষোল আনা থাকলেও সেই প্রসঙ্গ তুলবার সাহস এই শর্মার নেই। বাজারে প্যাকেটজাত পরোটা অবশ্য পাওয়া যায়, ফ্রোজেন। ভেজে খেতে মন্দ লাগে না, সমস্যার মধ্যে তেলের পরিমাণ থাকে অসম্ভব বেশী। এই মাঝ বয়েসে এসে আবার দু'শ-পুরতে-এক-আঙ্গুল পরিস্থিতিতে পড়তে চাই না। সুতরাং কালে ভদ্রেই এই বস্তুটির এই গৃহে পদার্পণ হয়। ছেলেমেয়েরা অবশ্য পছন্দ করে। তাদের জন্যেই মাঝে মাঝে আনা হয়। মুর্তিদার বিশ্ববিখ্যাত 'তেল চুপচুপে খাবো পেট পুরে' আলু ভাজির রেসিপি

মনে থাকায় কয়েকদিন বানিয়ে জাকি এবং ফারকে খাইয়ে বেশ একটা হৈ চৈ ফেলে দিয়েছি। দুই - কাঠি যত ইচ্ছা খাবে, সমস্যার কিছু দেখি না।

টরোন্টোতে যারা বেশ কিছুদিন ধরে থাকেন তারা জানেন এখানে এপার্টমেন্টে বসবাসকারী অনেক মহিলারা হাতে বানানো পরোটা, পুরি এবং সিঙ্গাড়া বিক্রী করে। এইগুলি বাসায় নিয়ে গিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে হয়, পরে প্রয়োজন মতো বের করে তেলে ভেজে নিলে খুব অল্প সময়ে মুখরোচক খাবার হয়ে যায়। যে কোন কারণেই হোক এই সর্বজনবিদিত তথ্যটি জানতে আমাদের কয়েকটা বছর কেটে যায়। যখন জানতে পারলাম ততদিনে আমরা এজাক্সের বাড়ীতে এসে উঠেছি। ফলে পরোটা আনতে হলে আমাকে ঘন্টাখানেক পথ ঠেঙ্গিয়ে স্কারবোরোর বিখ্যাত বাঙ্গালীপাড়া ড্যানফোর্থ এভিনিউয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেতে হয়। শুধুমাত্র তারাই কেন এই চুটকী ব্যবসাটা করেন সেটার পেছনেও সামান্য রহস্য আছে। এখানে প্রায় সব এপার্টমেন্ট কমপেক্সেই ভাড়ার সাথে ইলেকট্রিসিটির খরচ যুক্ত থাকে। ফলে যত ইচ্ছা রান্না করলেও খরচ বেশি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। নিজস্ব বাড়ীতে উঠে গেলেই সেই ছবি একেবারেই পাল্টে যায়। তখন ইলেকট্রিসিটি, গ্যাসের খরচ আলাদা গুনতে হয়। পরোটা বেচে যে লাভ হয় তাতে অতিরিক্ত খরচ তুলতেও কষ্ট হয়। তাছাড়া নিজস্ব বাড়ীতে উঠার পর সকলেরই মায়া মহব্বত থাকে বেশি। ঝুট ঝামেলা যত কম করা যায় ততই ভালো।

বন্ধু বান্ধবদের সূত্র ধরে বেশ কয়েকজন ভদ্রমহিলার খোঁজ পাওয়া গেলো যারা হাতে বানানো পরোটা বিক্রি করেন। বাজারের চেয়ে এইগুলি অনেক স্বাস্থ্যকর। তেল এবং অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর উপাদানগুলো ন্যূনতম ব্যবহার করা হয়। বহু বাংলাদেশীই একসাথে কয়েক ডজন করে কিনে গুদামজাত করে

থাকেন। বিশেষ করে বাসায় মেহমান এলে এদের চেয়ে উপকারী বন্ধু আর বুঝি কেউ নেই।

শীত উঁকি দিচ্ছে দিচ্ছে, ঠিক এমন সময় আমার আমেরিকাবাসী বোন টরোন্টোতে বেড়াতে আসার আগ্রহ প্রকাশ করলো। তাদের আগমন সবসময়ই ভয়াবহ রকম উত্তেজনার ব্যাপার হয়ে ওঠে এই বাসায়-প্রধানত বাচ্চাদের কারণে। তাদের চার বছরের পুত্রসন্তান এবং আমাদের দুটিতে মিলে মুহূর্তের মধ্যে মাছের বাজার বসিয়ে দেয়। তাদের হৈ-চৈ, ঝগড়াঝাটি, এমনকি ঠেলাঠেলিতেও আমাদের অবশ্য কোন বিকার হয় না। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, শিশুদেরকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিলে তারা কোন এক মন্ত্রবলে নিজেদের সমস্যাগুলো প্রায়শই মিটিয়ে ফেলতে পারে। অবশ্য ইত্যবসরে দু'চারটি কিল থাপ্পড় ছোড়া হবে না দিব্যি করে সেটা বলা যাবে না। নজর রাখা ভালো।

বোন এবং বোনজামাই দু'জনাই টরোন্টোর হাতে বেলা পরোটার ভক্ত। তারা আগেই জানিয়ে রেখেছে এই বস্তুটি যেন অঢেল জমিয়ে রাখা হয়। ভুনা গোশত আর পরোটা নাকি ঢাকার কথা মনে করিয়ে দেয়। মাঝবয়েসী মানুষদের বোধহয় স্মৃতি রোমন্থনের রোগ পেয়ে বসে। ছুটির দিনে খিঁচুড়ী খেতে বসলে নির্ঘাৎ বাল্যকালের অসংখ্য খিঁচুড়ীজড়িত স্মৃতিকথা মনের কপাট খুলে উঁকিঝুঁকি দিতে শুর" করে। অর্ধাঙ্গিনীর মাঝ বয়েসী হতে কিছু বাকি আছে কিন্তু সেও এই ব্যাপারে আমার চেয়ে কম যায় না। পরোটা এবং চিনি নিয়েও তার বহু স্মৃতি জড়িত আছে। ছোটবেলায় বাংলাদেশের মাটিতে বসে চিনি দিয়ে পরোটা খায়নি এমন কে আছে?

কথায় কথায় বেলা যায়। তাদের আসা উপলক্ষ্যে জনৈক বর্ষীয়ান মহিলার কাছে অর্ধশতাধিক পরোটা, কয়েক ডজন পুরি এবং সিঙ্গাড়ার অর্ডার দেয়

শিলি। বেশ কয়েকজনের দ্বারে হানা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ড় এই মহিয়সীকে পেয়ে সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। নিজ হাতে এই বেলা-বেলির কাজ সময়সাপেক্ষ, ফলে অনেকেই যারা এসব করেন সবসময় সবার অর্ডার নিতে পারেন না। তাছাড়া তারা কেউ কেউ শুধুমাত্র অতিরিক্ত সময়েই এসব করেন, কিছু অতিরিক্ত আয়ের সূত্র হিসাবে। বয়েসী ভদ্রমহিলাটির নাম জেনেছি আলেয়া। আগে পরে কি আছে জানা যায় নি। তিনি নিজেকে সবার কাছে এই নামেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। আমরা তাকে কখনো দেখি নাই। এটাই তার কাছে আমাদের প্রথম অর্ডার দেয়া। আনতে গেলেই দেখা হয়ে যাবে।

আমার কাজ যেখানে, সেখানে গাড়ী চালিয়ে গেলেই সবচেয়ে অল্প সময়ে এবং অল্প ঝামেলায় পৌঁছানো যায়। টরোন্টো ডাউনটাউন থেকে যথেষ্ট উত্তরে এই এলাকা এখনও বেশ হাল্কা বসতি, একটু খুঁজলেই স্বল্প খরচে পার্কিং পাওয়া যায়। অধিকাংশ মানুষই যারা ডাউনটাউনে কাজ করতে যান পার্কিংয়ের ভয়াবহ খরচের কারণে সাধারণত গাড়ী নিয়ে যান না। ট্রেনে-বাসে যাতায়াত করেন। ভীড়-ভাট্টায় মাথা খোটার প্রয়োজন হয় না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু ড্রাইভ করতেও মন্দ লাগে না। গান চালিয়ে দিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ছন্দটাকে উপভোগ করতে করতে দুলকি চালে চলতে বিশেষ ধরণের আনন্দ আছে। কিছুদিন ধরে আমি সেই আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ পাচ্ছি।

অফিস ফেরতা পথে শিলির ফোন পেয়েই আন্দাজ করেছিলাম ফাউ হুজুতে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি। রহস্য উন্মোচন হতে বিরক্তির শেষ হলাম। সে আমাকে ভীড় ঠেলে স্কারবোরোর গভীরে ড্যানফোর্থ এভিনিউয়ের নিকটবর্তী ক্রিসেন্ট রোডের উপর অবস্থিত একটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে যাবার নির্দেশ দিলো। এখানেই আলেয়ার বসবাস। হাইওয়ে ৪০। এর উপর ভীড় থাকলেও গাড়ী তবুও এগোয়। সেখান থেকে এক্সিট নিয়ে লোকাল রাস্ড়ায় উঠতেই বুঝলাম কত ধানে

কত চাল। গাড়ী দুই পা যায় তো এক ঘন্টা অনড় বসে থাকে। অন্ড়ত সেই রকমই মনে হলো। শাপ-শাপান্ড় করতে করতে রেডিওর কণ্ঠ চড়িয়ে দেই, কিন্তু তাতেও গোস্বা যায় না। শিলিরই পিন্ডি চটকাতে থাকি। জেনে শুনে যে নিজের পতিকে এই পরিস্থিতিতে ঠেলে দিতে পারে তার চেয়ে নিষ্ঠুর আর কে হতে পারে? অকারণে হর্ণ দিতে শুনে মেজাজটা তড়াক করে ছাদ ফুটো করে গগনমুখী হয়ে গেলো। নিজের হর্ণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক্কা দশ সেকেন্ড বাজিয়ে সকলের কান ঝালাপালা করে দিলাম। দিবি আর ফাউ হর্ণ? ফাজিল।

দেখতে দেখতে যেমন যৌবন চলে যায়। সেই একই গতিতে না হলেও এই যন্ত্রণা কাতর যাত্রারও সমাপ্তি নজরে পড়ে, দীর্ঘক্ষণ পরে। ইচ্ছে করেই ঘড়ি দেখা থেকে বিরত থাকি। সময়ের হিসেবটা আপাতত ভুলে থাকলেই ভালো। ক্রিসেন্ট রোডে একাধিক সুউচ্চ দালান রয়েছে। সেখানে গিয়ে খেয়াল হলো বিল্ডিংয়ের নাম্বার সহ অন্যান্য সব তথ্যই ক্রমশঃ বর্ধমান স্মৃতির চোরাবালিতে তলিয়ে গেছে। এই বয়েসেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বার্ধক্যে কি হবে সেই চিন্ড়ায় আমার অকালপক্ক ছেলেমেয়ে দুটিকে নির্লজ্জের মতো চোখ ঘুরিয়ে হাসতে দেখি প্রায়ই। অথচ এই ব্যাপারে তারাও কোন অংশেই কম যায় না। প্রায়ই তাদেরকে দেখি নিজেদের জিনিষপত্র হারিয়ে ভ্যা ভ্যা করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। জননী দয়াপরবশ হয়ে খুঁজে দিলে তবে নিরস্ড় হতে দেখি।

ফোন লাগাই বাসায়। ফার ধরে। চারে পড়ার পর থেকে বাসার ফোন অন্য কারো ধরবার উপায় নেই। সে লম্ফ ঝম্প দিয়ে চিলের মতো ছোঁ মেরে রিসিভারটাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে। তার কাছ থেকে সেটাকে উদ্ধার করতে বেগ পেতে হয়। কথা অবশ্য বেশী এগোয় না। কথা বলবার আগ্রহ তার কম। সে ফোন হাতে অন্যান্য কাজে ব্যস্ড় হয়ে পড়ে। বার তিনেক হ্যালো-হ্যালো করে চিৎকার করেও যখন কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া গেলো না তখন বিরক্ত হয়ে শিলির

সেলে ফোন লাগাই। এবার তাকে পাওয়া গেলো। জানা গেলো কন্যা আমার সাথে কথা বলতে আগ্রহী তবে তার আগে পুতুল পুত্রের খাওয়া শেষ করা প্রয়োজন; কিছু সময় লাগবে। রাগ করে কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে যাই। এই মেয়েটিই আমাকে যা একটু আদর যত্ন করে থাকে। তার মা এবং ভাই প্রায়ই আমার অস্ড়িত্বকে পরিপূর্ণভাবে অবহেলা করে থাকেন।

শিলির কাছ থেকে বিল্ডিং নাম্বার ফোন নাম্বার পাওয়া গেলো। এপার্টমেন্ট নাম্বার বা বাজার নাম্বার তার জানা নেই। আলেয়ার সাথে তার কথা হয়েছিলো একবার। তখন আলেয়া তাকে সঠিকভাবে জানাতে পারেননি। শিলি আমাকে সোজা সাপটা জানিয়ে দিলো আলেয়াকে ফোন করে জেনে নিতে। সে ব্যস্ড়। ফোন কেটে যায়। বিরক্ত হই। বাজার নম্বর না জানলে ভেতরে ঢোকাটা কষ্ট। কেউ ঢুকলে তার সাথে ঢুকতে হয়। সাধারণত অসুবিধা হয় না; কিন্তু কখনো সখনো মানুষজন সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকায়। ভাবখানা তুমি কে হে, ঢুকে গেলে যে?

আলেয়ার নাম্বারে ফোন করলাম। চারবার বেজে আনসারিং মেশিনে চলে গেলো। মেসেজ রাখলাম। পরোটা নিতে এসেছি; কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারছি না। এপার্টমেন্ট নাম্বারও জানা নেই। মেসেজ পাওয়া মাত্র ফোন দিতে অনুরোধ জানাই। পনেরো মিনিটেও যখন আমার ফোন বাজে না তখন আরেক কাঠি অতিরিক্ত বিরক্তি নিয়ে ফোন করি। চতুর্থবার বাজার পর আনসারিং মেশিন এ চলে গেলো, মেসেজ রাখবো কি রাখবো না ভাবছি তখন একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠ পেছনের যান্ত্রিক কণ্ঠের সম্ভাষণকে চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি আলেয়া! আপনি কে? হ্যাগা?'

নাম বললাম। উদ্দেশ্য বললাম। ঠিকানা এবং বাজার নাম্বার দেবার অনুরোধ জানালাম।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। - 'বাজার নাম্বারতো জানি না বাবা। এইটাতো লাগে না। দুনিয়ার মানুষ আইতাছে যাইতাছে, ঢুইকা পড়েন।'

মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ি। কোন বিটলার খপ্পরে না পড়লেই হয়। 'আপনার এপার্টমেন্ট নম্বর কত?'

আবার ক্ষনিকের নীরবতা। 'মনে নাই বাবা। দুই হাজার কিছু একটা। মাত্র চার মাস আসছি বুঝতাছেন না বাবা। এতো কিছু মনে রাখন যায়?'

শ্রাগ করি। এই ভদ্রমহিলা নিজের এপার্টমেন্ট নাম্বার পর্যন্ড় না জেনে কিভাবে দিব্যি এমন একটা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন মাথায় ঢুকলো না। বললাম, তাহলে আপনি নিচে এসে দিয়ে যান। আমি দরজার সামনে থাকবো।

'হেইডাতো পার্ম না। আমার কাছে চাবি নাই। আমার মাইয়া আর জামাই কামে গেছে। আইতে আরো ঘন্টাখানেক।

মাথায় ব্যথার সংকেত পাই। একি বিপদে পড়লাম! পাক্কা একটা ঘন্টা ভিড় মাড়িয়ে মাড়িয়ে এই মুলুকে এসেছি এখন পরোটা না নিয়ে কোন অবস্থাতেই বিদায় হচ্ছি না। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি জরীপ করি। আলেয়ার কাছ থেকে কোন না কোন তথ্য নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

'আপনি কোন তলায় থাকেন?'

‘কইলাম না দুই হাজার কিছু একটা।’ উল্টা ধমক এলো। ‘দুই হাজার হইলো বিশ তলা। এইডাও জানেন না।’

নীরবে হজম করি। ‘বিশ তলায় যাবার পর কি করবো?’

‘ডাইনে আইবেন। আমি দরজা খুইলা উঁকি দিমু। আমাকে দেখলেই চিনতে পারবেন। আমার মাথার চুল সব সাদা। আসেন। আমি পরোটা রেডি করতাছি।

লাইন কেটে গেলো। তাকিয়ে দেখলাম বহু অফিস ফেরত মানুষই দরজা খুলে সার বেঁধে ভেতরে ঢুকছে। ভেতরের লবীতে কিছু বুড়া-বুড়ি দল বেঁধে গল্প-সল্প করছে। শরতের শেষ প্রায়, বাতাস বেশ ঠান্ডা। সাধারণ জ্যাকেটে আর মানায় না। আমি নির্বিকার মুখে দুই ভদ্রলোকের পিছু নিয়ে সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তারা দু’জন ফিরেও তাকালেন না। হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন আসছে যাচ্ছে, কেউ কাউকে প্রশ্ন করে না। অন্ড়ত সেটাই ধারণা করেছিলাম। কিন্তু বুড়ো-বুড়ির দলটি থেকে যখন থুরথুরে একজন বুড়ি হাতের ষষ্ঠিতে খটাখট শব্দ তুলে আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালো আমি অল্পবিস্ড়র ভড়কেই গেলাম। এ আবার কি আপদ!

‘কোথায় যাচ্ছো?’ শ্বেতাঙ্গ বুড়ি ইচ্ছে করেই কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকের চেয়ে কর্কশ করে প্রশ্ন ছুড়ে দিলো।

ভড়কে যাই। যেখানেই যাই বুড়ির তাতে কি? আমাকে জেরা করার অধিকার তাকে কে দিয়েছে?

‘এইতো, উপরে।’ আমতা আমতা করে বলি। বুড়ি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ড় পরখ করে। ‘এই দালানে যারা থাকে তাদের সবাইকে চিনি আমি। ছেলে-মেয়ে নারী-পুর“ষ সবাইকে, তুমি বাইরের। ভেবেছো বুড়ো

হয়েছি বলে মানুষ চিনি না। তোমার মত বদমায়েশকে আমি বাতাসে তুলে আছাড় মারতে পারি .....।'

এই বার রীতিমতো ঘাবড়ানোর পালা। বেশী হৈ চৈ শুর" করলে অন্যরাও থেমে যাবে, সিকিউরিটিকে ডাকা হতে পারে, সে আরেক নাজুক অবস্থা। বুড়ির সঙ্গী এবং সঙ্গীনিরা দল পাকিয়ে এগিয়ে এলো।

বুড়ি তর্জনী নাচিয়ে ধমক দিচ্ছে, 'ইচ্ছে করলেই তুমি ঢুকে যেতে পারো না। দাঁড়াও আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি। ফোন আছে কারো কাছে?

না সূচক মাথা দোলানোর বহর লেগে গেলো। বুড়ি আমার দিকে তাকালো। 'তোমার ফোনটা দাও।'

আমি চারদিকে দ্র"ত চোখ বোলালাম। বেশী বিপদ দেখলে ঝেড়ে দৌড় দেবো। পরোটা চুলোয় যাক। সারা দুনিয়ার মানুষ যেখানে সেখানে ঢুকে যাচ্ছে আর আমার কপালে এসে জুটেছে এই যুধিষ্ঠির। আমি হাবার মতো মাথা দোলাই। কিসের ফোন?

বুড়ি চোখ কুচকে আমাকে দেখলো। 'বেশী চালাক তুমি, যাও, আজকের মতো তোমাকে ছেড়ে দিলাম। আবার যদি দেখি পুলিশ ডাকবো। মনে থাকে যেন।'

পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ফেলে দৌড়ে এলিভেটরে সওয়ার হই। পূর্ণ সে তরী। অফিস ফেরত ট্রাফিক মিলেছে ছেলে মেয়েদের বৈকালিক আন্ড় ঃএপার্টমেন্ট ভ্রমণের সাথে। প্যানেলের প্রতিটি বোতামই জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

দুই থেকে শেষ পর্যন্ড়। ধৈর্যের অবতার বনে যাবার চেষ্টা করি। এলিভেটরের এক কোণে হেলান দিয়ে দু'চোখের পাতাও লাগিয়ে ফেলি কয়েক মুহূর্তের জন্য।

গন্ড়ব্যে নেমে আলেয়ার নির্দেশ মোতাবেক ডানে এগিয়ে যাই। সুদীর্ঘ করিডোর বেয়ে হাটতে থাকি, আশা করি আলেয়া দরজা খুলে বাহিরে আসবেন। সে আশায় গুড়ে বালি। তিনবার পুরো বিশ তলার করিডোর চক্কর মারলাম। আলেয়ার কোন দেখা নেই। আবার ফোন করলাম। এবার দুয়ার খুললো। আলেয়ার দর্শন পাওয়া গেলো। ভদ্রমহিলার বয়েস ষাটের কাছাকাছি। বয়েসের তুলনায় বার্ধক্যের ছাপ বেশীই মনে হলো যদিও ঠোটের ডগায় চমৎকার এক টুকরো হাসি ঝুলছে।

"খুব কষ্ট পাইলেন বাবা। আমি তো বেশী বাইরে যাই না, সব ভালোমতো চিনি না। ভেতরে আসেন। ওরা তো কেউ নাই।"

ভেতরে ঢুকি। পরিপাটি করে সাজানো দুই বেডর"মের এপার্টমেন্ট। দামী সোফা, ডাইনিং টেবিল। দেয়ালে র"চিসম্পন্ন তৈলচিত্রের ডুপিকেট। রান্নাঘরে অবশ্য লন্ডভন্ড। আলেয়া নতুন অর্ডার পেয়েছেন। কাজ করছিলেন। আমাদেরটা আগেই করেছেন। ফ্রিজে ছিলো। হাসি মুখে বললেন, 'অনেক অর্ডার পাই বাবা, সেই আমেরিকাতেও আমার পরোটা যায়। মানুষ খাইয়া খুশী হয়। মনডা ভালো লাগে। বাসায় বইসা কিছু করনতো লাগে, নাকি? এই দ্যাখেন আপনার লগে আরো তিনডা অর্ডার, হেরাও আইয়া পড়বো একটু পরেই।'

ভালো। নীচে পাগলি বুড়ির খপ্পড়ে পড়লে পরোটা খাবার সখ চলে যাবে। বুড়ি চলে না গিয়ে থাকলেই হয়। শুধু আমি একাই কেন বকা খাবো?

আমি দ্রুত টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম আলেয়া থামালেন। 'ছবি দ্যাখবেন না একটু? আমার দুইটা নাতি। যা দুষ্ট! দাঁড়ান এলবামটা লইয়া আসি, একটু খাঁড়ান।'

আমাকে লিভিংরুমে দাঁড় করিয়ে রেখে আলেয়া শোবার ঘরে গেলেন এলবাম আনতে। আমি হাসবো কি কাঁদবো বুঝি না। জানা নেই শোনা নেই এতোখানি বিশ্বাস করাটা কি তার ঠিক হচ্ছে? কত পদের মানুষ আছে এই শহরে।

আলেয়া আমাকে সম্পূর্ণ এলবাম না দেখিয়ে ছাড়লেন না। তার একটাই মেয়ে। নার্স। তার শিশুকালের ছবিও দেখতে হলো। ছবি দেখা শেষ হতে তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কি চান বাবা? ভুইলা গেছি।'

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ি। আলেয়ার মেয়ের সাথে শিলিকে আলাপ করতে বলবো বলে মানসিকভাবে নিজেকে নির্দেশ দিয়ে রাখি। বেচারী হয়তো জানেও না তার মায়ের স্মৃতিশক্তি কেমন নাজুক পর্যায়ের। পরোটার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভয়াবহ লজ্জিত হলেন 'ছিঃ ছিঃ, কি পাগোলডা হইছি আমি কন দেহি? এক্কেরে ভুইলা গেছি। বয়েস হইতাছে। কিন্তু আমার পরাডা খাইলে জিভে লাইগা থাকবো। একটা ভাইজা দিমু? আলু ভাজি আছে।'

আলু ভাজি? আমি দোদুল্যমান হয়ে পড়ি। দুপুরে সামান্যই খাই। ক্ষিধায় পেট ইতিমধ্যে চোঁ চোঁ করছে। পরোটা আলুভাজির প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় জিভে পর্যন্ড় লালা গড়িয়ে পড়ছে। অনেক কষ্টে লোভ সংবরণ করে পরোটা এবং পুরির ব্যাগ নিয়ে করিডোরে নামি। রাস্ড়ায় কি ধরণের ভীড়ে পড়বো সেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন

হয়ে উঠেছি। এলিভেটর পেতে কিঞ্চিৎ দেরী হলো। নীচে নেমে বুড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনন্দিতই হলাম। আমার পরে যারা আসছে তাদের কপালে যে ভোগান্ড়ি আছে সেটা মানসচক্ষে দেখে মনে মনে বেশ একটা হাসিও হলো। আমাকে দেখেই চোখ ছোট ছোট করে তাকালো বুড়ি। হাতে ঝোলা দেখ্লো। তর্জনী উঠে গেলো। নিঃশব্দ শাষানী। আবার এসেছো তো মরেছো। আসতে আমার বয়েই গেছে। গাড়ীতে উঠে আমি ভো করে পগার পার হয়ে যাবো। আমি মুখ বাকিয়ে হেসে সদর দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাই। পেছনে দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়।

গাড়ীর দরজা খুলে মাত্র হাতের মালামাল খালাস করেছি ফোন বেজে উঠলো। শিলি।

"একটা সমস্যা হয়ে গেছে।" সে বললো।

'কি সমস্যা' মেজাজ দেখিয়েই বলি। বাসায় ফিরতে চাই। খাতির করছি ভাবলে আরো দশটা কাজ চাপিয়ে দেবে।

'আলেয়া ফোন করেছিলো। তুমি এলিভেটরে ওঠার পর পরই। তোমাকে ভুল ব্যাগ দিয়েছে।'

'কি!' আমি স্পষ্টতই ধমকে উঠি।

কিছুক্ষণ নীরব অন্য পক্ষ। 'আবার একটু যাও পিজ। আমাকে খুব করে বলেছেন উনি। পিজ?'

বিরক্ত চোখে সদর দরজার ওপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বুড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই সেই অবান্ড়র চিন্ড়া নিমেষে বাদ দিলাম। এবার আমার মাথা আন্ড় চিবিয়ে খাবে।

'কম দিয়েছেন না বেশী দিয়েছেন?' লজ্জার মাথা খেয়ে জানতে চাই।

'বেশী। অনেক বেশী।'

বুক ভরে শ্বাস নেই। একটু চামারগিরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি নির"পায়। বললাম, 'ফোন করে বলে দাও আমাকে পাওনি।' লাইন কেটে দিই।

সেই পরোটা আমরা সবাই মিলে খুবই তৃপ্তি সহকারে খেলাম। আলেয়া মিথ্যে বলেননি। তার পরোটার স্বাদ অতুলনীয়। সবাই খেয়ে বাহবা দিলাম। যদিও বন্ধু মহলে কিঞ্চিৎ বদনাম হয়ে থাকবে। আলেয়ার মেয়ের সাথে আমাদের এক ঘনিষ্ট বন্ধু পরিবারের স্ত্রীর গলায় গলায় ভাব। জানা গেলো আমি এমনিই হীন ব্যক্তি যে এক বৃদ্ধার স্মৃতিভ্রমের সুযোগ নিয়ে বেশী পরোটা হাতিয়ে সটকে পড়ি। আমার মতো মানুষদের জন্যেই পৃথিবীতে এতো ব্যথা-বেদনা।

আরে বাহ্। যত দোষ নন্দ ঘোষের।